হিন্দু।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার রায় দ্বারা
প্রকাশিত।
১৮৮।১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা,
৮২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান,
নিউটন প্রেসে,
শ্রীশ্রীমন্ত রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩১২ সাল।

"নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তদনুবিভ্রতে
অথবিশ্বস্য সংহর্ত্রে তুভ্যম্ ক্রোধাগ্নিতাত্মনে ॥"

পুস্তক রচনা আমার ন্যায় লোকের পক্ষে দুষ্কর। একে ত সময় অল্প, দ্বিতীয়তঃ ভাষার লালিত্য আছে না আছে জানি না। ভাষা যদি চিত্তাকর্ষক না হয় তবে লেখা বৃথা। লিখি বা না লিখি, মন কিন্তু মানে না; মস্ত চিন্তায় ব্যস্ত, বিশেষ ধর্ম্ম বিষয়ে।

ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টপদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়। কিরূপে জগৎ সৃষ্ট, কিরূপে জীব-লতাগুল্ম প্রভৃতির উৎপত্তি, কি কারণে এ বিশ্বের সৃষ্টি, ইহা চিরচিত্তাকর্ষক যুগযুগান্তর গত হইল, এ সমস্যার কত কত জীবন অতিবাহিত হইল; কিন্তু উত্তর সেই দুরারোহ, সেই মত মানবের অস্পৃশ্য মনুষ্য জীবনে সৃষ্টি কৌশল প্রকটিত হওয়া ভগবদেচ্ছাভূত; কিন্তু ভগবান অবাং মনস গোচরং। যে পদার্থ এরূপ দুর্ব্বোধ্য তাঁহার ইচ্ছা অধিকতর দুর্ব্বোধ্যই সম্ভব। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। ইচ্ছাগত কার্য্য স্বতঃই ইন্দ্রিয়ের বোধগম্য, কিন্তু ইচ্ছাময় দুর্গম। মনুষ্য জীবনের ইহাই ঘোর কলঙ্ক। কত কত মহাপুরুষ এই অভিযানে অরণ্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও ভগবানের দয়া দৃশ্যমান হয় না। অন্যান্য দেশে উত্তরোত্তর বিকশিত হইতেছে কিনা তাহা জানি না; কিন্তু ভারতে তাহা দেখা যায় না। যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতবাসকালে ধর্ম্মের তত্ত্ব পর্ব্বতগহ্বরে লুকায়িত ছিল, এখন বোধ হয় ভারতপক্ষে রসাতলস্থ।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত বর্ণাশ্রম আপাততঃ জড়ীভূত ; সে জন্য ধর্ম্মচিন্তায় বর্ণচিন্তা আসিয়া পড়ে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী বিভাগে মনুষ্যকে আমি চারিজাতিতে বিভাগ করিয়াছি।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।"

* * * * শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

তত্ত্ববিত্তো মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতিমত্বা ন সজ্জতে॥

গুণ ও কর্ম্মহেতু বর্ণবিভাগ যদি ভগবদেচ্ছা তবে জন্মহেতু বর্ণবিভাগ ভারতে আসিল কেন ? গুণ ও কর্ম্মহেতু বর্ণবিভাগ ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায় ভারতে তাহা কই ? ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণের জন্ম দিতে সক্ষম ; অন্যান্য মনুষ্যে ইহা অসম্ভব, এই বিশ্বাস অপনয়ন হেতু বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ;—

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।"

সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিই সর্ব্বতোভাবে অপরের বোধগম্য নহে, সে স্থলে বিষ্ণু অবতারের উপদেশাংশের কারণ নির্ণয় আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি লোকে সম্ভবপর নহে। কিন্তু ভগবদ্গীতা যদি সত্য হয়, তবে এ বাক্যও সত্য ; অর্থ পাঠক ইচ্ছানুযায়ী করিয়া লইবেন।

হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমের অসামঞ্জস্য বিষয়ক চিন্তায় কখন কখন আমার মন আন্দোলিত হয়। সেই আন্দোলনের সময়

আমার অনেক বন্ধুর সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হওয়ায় তিনি সংক্ষেপে আমার মত লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করায় এই প্রবন্ধের উৎপত্তি, এবং তাঁহার ও কয়েকটি অন্যান্য ভদ্রলোকের ইচ্ছায় সম্মতিক্রমে ইহা মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এ প্রবন্ধে এমন কথা আছে যাহা অনেকে প্রতিবাদ করিবেন, অনেকে দ্বৈধভাব দেখাইবেন; আবার অনেকে ভ্রান্তিমূলক বলিবেন; ইহা বড় বিচিত্র কথা নহে। এই যে সসাগরা ধরণী ইহাই যখন ভ্রান্তিমূলক, তখন তাহার ক্ষুদ্রাংশ উদ্ভূত অভিজ্ঞতামূলক যুক্তি ভ্রান্ত হইবে ইহা কি আশ্চর্য্য? বিশ্বে সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই একের সহিত অপরের প্রভেদ; মনুষ্য বুদ্ধিও প্রত্যেকে প্রভেদ; সে অবস্থায় মতভেদ না হওয়াই বরং চিন্তার কথা।

এ পুস্তকে নূতন ভাব কিছুই নাই; আমাদের ধর্ম্ম ও তদ্বিষয়ক আচারের অসামঞ্জস্য যাহা জনসমাজে অনেকে চিন্তা করেন তাহাই কতক পরিমাণে একত্রীকৃত হইয়াছে। এইরূপ ভাবে চিন্তা আমার মত লোকে সম্ভব ইহাই জ্ঞাপন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
সাং বালি, ৩৩ নং গাঙ্গুলিপাড়া লেন।

হিন্দু।
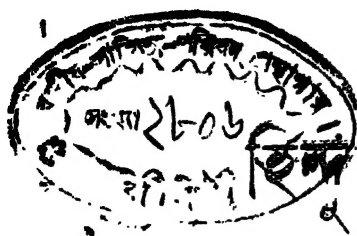
আজকাল অনেকেই "সিন্ধু" শব্দ হইতে "হিন্দু" শব্দের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। হিন্দু নামে পূর্ব্বে যবনেরা ভারত-বাসিদিগকে অভিহিত করিয়াছিলেন। অমরকোষে যদিও হিন্দু বা হিন্দুস্থান শব্দের উল্লেখ নাই তথাপি ভারতবর্ষ নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;—

লোকেঽয়ং ভারতবর্ষং
শরাবত্যাস্তু যোঽবধেঃ।

* * * * ইতি অমরঃ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণং
বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।

অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণস্থ ও সমুদ্রের উত্তরস্থ যে দেশ তাহার নাম ভারতবর্ষ।

পুরাণাদিতেও ভারতবর্ষের নাম দেখা যায়। যথা ;—

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।

বিষ্ণুপুরাণ।

ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে আর্য্যাবর্ত্ত নামও অভিধানে ব্যবহৃত দেখা যায়। অমরসিংহ লিখিয়াছেন ঃ—

আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্ম্মধ্যং
বিন্ধ্যহিমালয়োঃ

অন্য কোষকর্ত্তা আবার আর্য্যাবর্ত্তকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা :—

আসমুদ্রাচ্চবৈপূর্ব্বাৎ
আসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ।
তয়ো রেবান্তরং
আর্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধা॥

বিন্ধ্য হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া ব্যবহৃত হইত ও সেই দেশ পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অতএব পূর্ব্বকালে যাহাকে ভারতবর্ষ বলিত এখন সেই দেশ "হিন্দুস্থান" বা 'ইণ্ডিয়া" নামে অভিহিত হইতেছে। পারস্য ভাষায় "হিন্দুস্তান" শব্দ ছিল আমরা তাহাকে ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া "হিন্দুস্থান" করিয়া লইয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে "হিন্দু বা হিন্দুস্থান" শব্দ উভয়ই অনার্য্য ; হিন্দুদিগের নয়।

পূর্ব্বে আমরা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে অভিহিত করিতাম। "আর্য্য" অর্থে প্রাকৃত আচার পরায়ণ ব্যক্তি বুঝাইত।

কর্ত্তব্যং আচরণ্ কামম্
অকর্ত্তব্যং অনাচারম্।
তিষ্ঠতি প্রাকৃতাচারো
যঃ স আর্য্য ইতিস্মৃত॥

ইতি বশিষ্ঠ।

আর্য্য শব্দের অর্থে সমস্ত ভারতবাসীকে বুঝাইত কিনা বলা যায় না। দ্বিজেরা আপনাকে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন কিন্তু "জঘনং প্রভবঃ" শূদ্র যে আর্য্য মধ্যে গণ্য ছিল তাহা বলা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে আধুনিক হিন্দু শব্দের প্রতিশব্দ পূর্ব্বে কিছু ছিল না। তবে হিন্দু অর্থে এইমাত্র বুঝায় যে পূর্ব্বে ভারতবাসীর বংশজ যাঁহারা মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইয়াছেন তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু নামে অভিহিত করেন।

বৌদ্ধ হিন্দু, জৈন হিন্দু, শিখ হিন্দু, এমন কি সাঁওতাল কোল সেও কতক কতক হিন্দু। কিন্তু মুসলমান হিন্দু নয়, খ্রীষ্টান হিন্দু নয়।

হিন্দু ধর্ম্মের চিহ্ন এখন পুণ্য কার্য্যে বা ন্যায়পথে দেখা যায় না। ঈশ্বরভক্তি ও বিশ্বাসে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ চিহ্নও লক্ষিত হয় না।

ঈশ্বরত্ব এক আধারে, দুই আধারে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষে, তিন আধারে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে, তেত্রিশকোটি আধারে এবং অবশেষে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বাস কর বা আদৌ তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস না কর, তুমি পূর্ণ হিন্দু।

(২) ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, বিশ্বাকার মনুষ্যাকার, অদ্ভুত নৃসিংহাকার শূকরাকার, কূর্ম্মাকার, গাভীআকার পর্য্যন্তও বিশ্বাস কর তুমি পূর্ণ হিন্দু।

(৩) মলমূত্র পুরীষ প্রভৃতি জঘন্য দ্রব্য ভক্ষণ কর, তুমি হিন্দু। বরং ইতর সাধারণ সমক্ষে পূজ্যপাদ "অঘোরী" বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) তুমি পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, ভ্রাতা, শ্বশুর, শ্যালক প্রভৃতি যত কিছু আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করনা কেন তুমি হিন্দু।

(৫) তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নবশাক, কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল, মুসলমান প্রভৃতি যত শ্রেণীর সম্ভব স্ত্রীর সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর না কেন তুমি হিন্দু।

কিন্তু যদি তুমি নিরাকার ঈশ্বরের জয়ঢক্কা নিনাদ কর তুমি অহিন্দু। তুমি অন্ত শ্রেণী হিন্দুর পাচিত অন্ন ব্যঞ্জন আহার কর তুমি অহিন্দু। এবং যদি তুমি গোহত্যা কর তবে তুমি অহিন্দু। পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস কর বা নাই কর তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহা সর্ব্বসমক্ষে বর্জন করিলে তুমি অহিন্দু।

অন্ত বর্ণের মলমূত্র প্রভৃতি অখন্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে হিন্দুত্ব লোপ পায় না, কিন্তু তাহাদের অন্ন ভক্ষণ করিলে হিন্দুত্বের লোপ হয়। হিন্দুর সমক্ষে কি অসবর্ণের অন্ন, মলমূত্র অপেক্ষাও অধম? পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা অপেক্ষাও গোহত্যা কি নিন্দনীয়? ভিন্ন জাতীয় বা ভিন্নবর্ণের স্ত্রীর সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে দোষ নাই, কিন্তু সে স্ত্রী বিবাহিত বলিলেই তুমি অহিন্দু। হিন্দু বরং শত অসবর্ণের স্ত্রীকে পরস্ত্রী বলিবে, শত ভ্রূণহত্যার সক্ষম হইবে, কিন্তু তাহাকে বিবাহিত স্ত্রী বলিতে হিন্দুর প্রাণে কষ্ট হয়।

হিন্দু চৌর্য্যাপরাধে "আণ্ডামান" পিনাং যাইবে তাহাতে তাহার হিন্দুত্বের লোপ পাইবে না? হিন্দু পরদাসত্বে মরিসস্, সিচিলিশ, ট্রিনিডাড্ চিন, মিশর, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার গেলে হিন্দুত্ব লোপ হইবে না; কিন্তু বিদ্যালাভেচ্ছায়, ধর্ম্মযাজনায়, ব্যবসায় বা পরোপকারে যদি সমুদ্র পার হয়, তবে সে ঘোরতর অহিন্দু। তবে সে ম্লেচ্ছ।

কালের কুটিল গতিতে হিন্দু এখন ক্রমে সরলভাব ধারণ করিতেছে। অসবর্ণের অন্ন ভোজনে কিছু পূর্ব্বে হিন্দুত্ব লোপ পাইত; এখন দেখা যাইতেছে যে আহার করায় দোষ নাই, আহার করিয়াছি স্বীকার করায় বরং বিশেষ দোষ। এখন লোকে ক্রমে বিশ্বাস করিতেছেন যে, কুক্কুট গো মাংসাদি ভক্ষণে তত দোষ নাই; কিন্তু তাহা স্বীকার করায় বড় দোষ অর্থাৎ যদি কোন অহিন্দু অখাদ্য ভোজনের অপরাধের উপর মিথ্যা কথাদ্বারা তাহা অস্বীকার করেন, তবে তিনি হিন্দু। মিথ্যা কথা না বলিলে তিনি অহিন্দু। মিথ্যা কথার পাপ অখাদ্য ভোজনের পাপকে বিনাশ করিতে সক্ষম। "বিষে বিষক্ষয়"।

"ধর্ম্ম" অর্থে পুণ্য, স্বভাব, আচার, যম ও সোমপা বুঝায়। হিন্দুর ধর্ম্ম বলিলে হিন্দুর পুণ্য, স্বভাব ও আচার এই তিনটী সাধারণতঃ বুঝায়। কিন্তু "এখন হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা' বলিলে হিন্দুর কেবল "আচার" রক্ষাই বুঝায়। হিন্দুর সমক্ষে এখন গোবধ, অসবর্ণের অন্নভোজন ও অসবর্ণে বিবাহ এই তিনটী মহাপাপ। এই মহাপাপ হইতে পৃথক থাকাই হিন্দুর আচার, হিন্দুর কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই পাপের নব বিধানমত প্রায়শ্চিত্ত অতি রমণীয়। ইহাতে কঠোরতার লেশ মাত্রও নাই এবং ক্রিয়াও অতি অল্প। প্রায়শ্চিত্ত এই:—যখন কোনও ব্যক্তি সমাজে এ কথা উত্থাপন করিবে এবং আন্দোলন গুরুতর হইবে, তখন একবার অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিবে।

যে আচার রক্ষার জন্য সমাজ মিথ্যা কথার প্রশ্রয় দেয়, সে কি কখনও সদাচার মধ্যে গণ্য হইতে পারে? তাহাদ্বারা কি

কখনও পুণ্য সঞ্চয় সম্ভব?' সে আচার কি ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে?

ভারতের এ অবস্থা কখনও ছিল না। সহস্র বৎসর পর দাসত্বে বিব্রত হইয়া সমাজের সে দৃঢ়তার, সে ধর্ম্মভীরুতার, সে সত্যপরতার লোপ হইতেছে। যে—ধর্ম্মের গৌরবে আমাদের মন পুলকিত হয় সে—কি এই? যে হিন্দু এককালে সত্যের জন্য অসংখ্য কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, যাহাদের রাজারাও সত্যপালন জন্য বনে যাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না সেই হিন্দু আজ কি না সমাজচ্যুতির ভয়ে মিথ্যা কথা বলিবে? কি পরিতাপ! যে হিন্দুরা এককালে সত্যের তুলনায় রাজ্যপদ তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, তাঁহাদের বংশধরেরা আজ বলিতেছেন "সমাজের জন্য সত্য-ত্যাগ করুন।"

ভারত চাতুরতায়, মিথ্যায়, প্রবঞ্চনায় বা কপটতায় কখনও উন্নত ছিলনা। ভারত উদারতায়, সত্যতায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধৈর্য্যে, নিঃস্বার্থবৃত্তিতে সর্ব্বাগ্র ছিল। ভারতের সে সব মহা-পুরুষের কীর্ত্তি লক্ষ লক্ষ শ্লোকে আজও বর্ণিত রহিয়াছে। এখন সঙ্কীর্ণাত্মা, অপরিণামদর্শী সকল সেই মহাপুরুষের বংশজ বলিয়া অনায়াসে আত্মপরিচয় দেন। কিন্তু যদি সেই সকল মহাপুরুষের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ এখনও ইহাঁদিগের মধ্যে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও ইহাঁদিগকে ধন্য বলিতে হইবে।

যে ভারত প্রশংসায় বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তা বেদব্যাস উন্মত্তভাবে লিখিয়াছেন;—

গায়ন্তিদেবাঃ কিল গীতকানি,

ধন্যাস্তু যে ভারত ভূমিভাগে।

স্বর্গাপবর্গাস্পদ হেতুভূতে,
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥
কর্ম্মাণ্য সঙ্কল্পিত তৎফলানি
সংনস্থ বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্যতাম্ কর্ম্ম মহীমনন্তে
তস্মিল্লঁয়ং যে ত্বমলা প্রয়ান্তি ॥
জানীমো নৈতৎ ক বয়ম্ বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধন।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলুতে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয় বিপ্রহীনাঃ ॥

সে ভারত কি আর আছে? এ ভারতে কি মনুষ্য "সুরত্বের" জন্য জন্মগ্রহণ করিতে পারে। "সুরত্ব"ত দূরে থাক "ব্রাহ্মণের" জন্ম হওয়াই ভারতে দুর্লভ।

মহাভারতে যে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য লইয়া এত কথা লেখা আছে কেহ কি একবার ভাবিয়া দেখেন সে ব্রাহ্মণ কিরূপ? মহাভারতের শুকানুশাসনে মহর্ষি বেদব্যাস লিখিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্যত্বনুপমং সুখং।
ব্রাহ্মণ্যং বহুভিরবাপ্যতে তপোভি স্তল্লঁব্জা
ন বতিপরেণ হেলিতব্যাম্।
স্বাধ্যায়ে তপসি দমেন নিত্যযুক্তো
ক্ষেমার্থী কুশলপরঃ—সদা যতস্ব ॥

এরূপ ব্রাহ্মণের জীবন যে আদর্শস্বরূপ ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এখন সেরূপ ব্রাহ্মণ কয় জন? ব্রাহ্মণের অধঃ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণাশ্রিত হিন্দুধর্ম্মেরও অধঃপতনের সূত্রপাত।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ নিজবলে বলীয়ান্. নিজবলে দীপ্তমান্ ছিলেন ও সেই হেতু ব্রাহ্মণ উদারতার আধার ছিলেন। উপনিষদে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ শ্রোতা, ক্ষত্রিয় বক্তা; কিন্তু কালবশতঃ ব্রাহ্মণের আন্তরিক তেজ যত নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বাহ্যাড়ম্বরদ্বারা আত্মতেজ বিকীরণে তৎপর হইতে লাগিলেন এবং কালে সঙ্কীর্ণভাব ধারণ করিয়া অন্যান্যবর্ণের উপর কঠোর শাসন আরম্ভ করিলেন। তখন আর ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য বর্ণ বক্তা হইতে পারিত না।

অন্তঃশাসনের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক শাসন অর্থাৎ "আচার" বা "সামাজিকতা" আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য সেরূপভাবে সৎকার্য্যে দৃশ্যমান্ হয় না। কাজেই "আচারের" উপর ব্রহ্মণ্য নির্ভর করিতে লাগিল। ক্রমে ব্রহ্মণ্যও যত দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল "আচারও" তত ক্ষীণ হইতে লাগিল। এখন সে "আচার" অনেক স্থলে কেবল নাম-মাত্র মিথ্যাকথার উপর নির্ভর করিতেছে।

"আচার" পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপক্ষে কঠিন, ক্ষত্রিয়পক্ষে তদপেক্ষা লঘু, ক্রমে নিকৃষ্টবর্ণের মধ্যে আচারের কাঠিন্য লক্ষিত হইত না। ক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তখন শূদ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত "তুষানল" "অঙ্গচ্ছেদন" কিন্তু ব্রাহ্মণপক্ষে গায়ত্রীজপ, প্রাণায়াম প্রভৃতি ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কোনও কোনও

শাস্ত্রকর্ত্তা এমনও লিখিয়াছেন যে কেবল প্রাতঃস্নান করিলেই সর্ব্বপাপ মোচন হইবে।

প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী সদাভবেৎ
সপ্তজন্মকৃতং পাপং ত্রিভিবর্ষে ব্যপোহতি
(ইতি দক্ষঃ)
উষস্যুষসি যৎস্নানং সন্ধ্যায়াম্ উদিতে রবৌ
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতক নাশনং।

যে সব পাপ শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয় শাস্ত্র কর্ত্তারা সেই সব পাপ উল্লেখ করিয়া কেহ প্রাতঃস্নান, কেহ অঘমর্ষণ মন্ত্র, কেহ গায়ত্রীজপ ইত্যাদি, পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে ব্রাহ্মণ পক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন। (অঘমর্ষণ মন্ত্র বৈদিক, শূদ্রের নিষিদ্ধ)

বৃহদ যম :—

মাতরং ভগিনীং গত্বা
মাতৃস্বসারং স্নুষাং সখীং
সনাভ্যাং চাগম্যাগমনং কৃত্বা ত্রিরঘমর্ষণং
অন্তর্জ্জলে ত্রিরাবর্ত্ত্য এতস্মাৎ পূতো ভবতি ॥

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য :—

ব্রহ্মহা সুরাপশ্চাগম্যাগামী তথৈব চ
সুবর্ণস্তেয় কৃচ্চৈব গোঘ্নো বিশ্বস্তঘাতকঃ
শরণাগতঘাতী চ কূটসাক্ষী অকার্যকৃৎ।
এবমাদিষু চান্যেষু পাতকেষু রতশ্চিরং
প্রাণায়াম শতং কৃত্বা মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।

পাপের কারণ ও সীমা পুরাণ ও শাস্ত্র কর্ত্তারা অদ্ভুত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সামান্য পাতকের কথাই বলি :—

বরাহপুরাণ :—

অকৃত্বা দন্তকাষ্ঠন্তু যো হি সামুপসর্পতি।

সর্ব্বকাল কৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥

অর্থাৎ দন্তধাবণ ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করিলে পূর্ব্ব পুণ্য বিনষ্ট হয়। কিন্তু পরে বরাহ পুরাণে আবার লিখিয়াছেন :—

অমায়াঞ্চৈব যো মূঢ়ো দন্তকাষ্ঠন্তু ভক্ষয়েৎ।

সোমস্তু হিংসিতস্তেন হিংসিতাশ্চ বসুন্ধরা ॥

নরসিংহ পুরাণে লিখিয়াছেন :—

প্রতিপদ্দর্শ ষষ্ঠীনু নবম্যাং চৈব সপ্তম্যাং

দন্তানাং কাষ্ঠ সংযোগো দহত্যা সপ্তমং কুলম্ ॥

অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ, ষষ্ঠী, সপ্তমী ও নবমী তিথিতে দন্তধাবন করিলে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পরিতপ্ত হয়।

এই ত সব শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের বচন। ইঁহাদের আজ্ঞা এখন বেদবাক্যের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হইলে প্রতিমাসে, আট দশ দিন মুখধাবন বন্ধ হইবে। এরূপ শত শত অসংলগ্ন অযৌক্তিক শ্লোক সমূহকে শাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি এবং লেখককে শাস্ত্রকর্ত্তা বলিয়া থাকি। যখন এ সকল আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হয়, তখন সোমরস পান হেতু মত্ততা নিবারণ ও সোমলতা রক্ষা করণে বোধ হয় ইহার প্রয়োজন ছিল। এখন কিন্তু সোমলতা দাঁতনে ব্যবহৃত হয় না; অতএব পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রোক্তি নিরর্থক।

যে সকল পুস্তকে ঘোরতর পাপের প্রশ্রয় দেয় তাহাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে ঘৃণা হয় না ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে পূর্ব্বে শ্লোক কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়াছি

সে সকল পাপ করিলে ব্রাহ্মণত্ব ত দূরে থাকুক শূদ্রত্ব তাহাতে থাকে না, তাহার পতিত্ব অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রকর্তারা ব্রাহ্মণপক্ষে তাহার লঘুতম দণ্ডের বিধান করিয়া গিয়াছেন।

আমরা রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ সমূহের উপর পূর্ণ আস্থা দিই; কিন্তু ঐ সকলের উপর কি আমাদের ধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে? রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও ব্রহ্মশাপ ব্যাখ্যা। হোমারের ইলিয়াডে যেরূপ একিলিসের ক্রোধ বর্ণনাই মুখ্য উদ্দেশ্য রামায়ণে ও মহাভারতে সেইরূপ পরীক্ষিতের ও দশরথের ব্রহ্মশাপই মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক দেশে এক গ্রামে বা এক পল্লীতে শত শত পুরুষ ধরিয়া বাস করিয়া যদি ব্রাহ্মণ অন্যান্য শ্রেণীর লোককে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করিতে সক্ষম নহেন, তবে তাঁহার উদারতা কই? সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া একত্রে বাস করিয়া যদি হিন্দু ব্রাহ্মণ, শূদ্রকে সমানচক্ষে না দেখিতে সক্ষম হয়, তবে ইংরাজ আজ দেড়শত বৎসরের মধ্যে ভিন্নদেশী, ভিন্নধর্ম্মী ও ভিন্নাচারী হিন্দু মুসলমানকে আপনার সমতুল্য জ্ঞান করিবে কেন?

যতদিন হিন্দু আপনাদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোককে সমান চক্ষে না দেখিবে, যতদিন হিন্দু মুসলমানকে আন্তরিক প্রেমের সহিত ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন কি হিন্দুর কি মুসলমানের, ইংরাজের সমতুল্য বলিবার অধিকার নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মুসলমান হিন্দু নয়, খ্রীষ্টান হিন্দু নয়, ইহার কারণ এই যে, উহাদের "আচারের" বা "সামাজিকতার"

সহিত হিন্দুর "আচারের" প্রভেদ। এই "আচারের" পার্থক্যের উপরই ধর্ম্মের বাক্‌বিতণ্ডা। ঈশ্বরত্বের জন্য নহে।

হিন্দুর "আচার" সর্ব্বদেশে একরূপ নহে। দেশে দেশে আচার প্রভেদ তবে পূর্ব্বলিখিত ৩টী মুখ্য "আচারের" উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করিতেছে। এই মুখ্য আচারমধ্যে দ্বিতীয়টীর জন্যই হিন্দু জাতীয়ত্বকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়াছে।

বর্ণবিভাগই যে হিন্দুর অধঃপতনের মূল এ বিষয়ে সন্দেহ কি? এই বর্ণবিভাগ জন্য ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য সর্ব্বশ্রেণী নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, এবং যুদ্ধবিদ্যায় অপারগতাহেতু আফগানের দাসত্ব স্বীকার করে। বর্ণবিভাগ ত্যাগ করিয়া "শিখ" হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া জগতে বীরনামে খ্যাত হইয়াছে। বর্ণবিভাগহেতু মহারাষ্ট্র রাজ্যের পতন। বর্ণবিভাগের মূলভিত্তি সংকীর্ণচিত্ত। এই সংকীর্ণচিত্ত দ্বারা জাতীয়ত্ব লাভ হয় না।

জাতীয়ত্বের মূল স্বজাতিমধ্যে সকলের স্বার্থের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি। সে দৃষ্টি বর্ণবিভাগসত্বে রাখা অসম্ভব। হিন্দু মনে করে না যে ব্রাহ্মণের স্বর্গ নরক শূদ্রের স্বর্গ নরক অপেক্ষা প্রভেদ। হিন্দু কখনও মনে করে না যে স্বর্গ নরকে বর্ণবিভাগ আছে। তবে এ বর্ণবিভাগ যায় না কেন?

ব্রাহ্মণ লজ্জার দায়ে স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না যে তাঁহাদের মধ্যে দুর্ব্বাসা ও বিশ্বামিত্রের আর জন্মগ্রহণ হয় না। একথা অন্যান্য বর্ণের লোকেরা সকলেই কতক কতক বুঝেন কিন্তু পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বকালে এত ব্রাহ্মণকে মুসলমান করা হইত যে তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত তুলাদণ্ডে ওজন হইত।

কিন্তু এরূপ অবস্থায় যখন ব্রাহ্মণের কোনও অভিসম্পাত কার্য্যকারী হয় নাই, তখন কেন যে লোকে ব্রহ্মশাপের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত ইহা বলা দায়।

এই বর্ণবিভাগ না যাইবার আরও এক কারণ এই যে, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা সর্ব্বদাই ছিল। সে জন্য ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলে মানিত তাহার প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত দেখা যায়। এখনও অনেকের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের যজ্ঞোপবীতের উপর নির্ভর করিতেছে।

সে জন্য কায়স্থ সন্তানেরা আজকাল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন। বঙ্গদেশস্থ যোগীরাও কম নহেন। যজ্ঞোপবীত যে কোন ব্রতধারণের চিহ্নমাত্র ইহা অনেকে জানেন না। ত্রিদণ্ডী সূত্রধারণে মোক্ষত্ব লাভ হয় না। ব্রহ্মণ্যবিহীন যজ্ঞোপবীত গলরজ্জু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে।

বর্ণবিভাগ অন্যান্য দেশে নাই। অনেকে বলিবেন যে, ইংলণ্ডেও বর্ণবিভাগ আছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে সে বর্ণবিভাগ এ বর্ণবিভাগ নহে। সেখানে পাদরীর সন্তান পাদরী হয় না বা কর্ম্মকার সন্তান আজন্ম কর্ম্মকার নামে অভিহিত হয় না। যে পাদরীর বৃত্তি লইবে, সেই পাদরী হইবে; যে কর্ম্মকারের বৃত্তি লইবে সেই কর্ম্মকার হইবে।

পূর্ব্বকালে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণপুত্র যে ব্রাহ্মণ হইত তাহা নহে। কবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :—

ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধো শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহম্ ক্ষাত্রধর্ম্মমিবাশ্রিতঃ॥ ১

অর্থাৎ "দিলীপের জানুদেশ স্থূল, স্কন্ধ বৃষপ্রায়, শাল-বিনিন্দিত বিশাল বাহু ও কর্ম্মক্ষম দেহ ছিল। এই হেতু ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

দিলীপ বৈবস্বত মনুর পুত্র। বৈবস্বত মনু ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্র ক্ষত্রিয় হইলেন। মহাভারত পাঠ করিলে এরূপ অনেক বর্ণ বিপর্য্যয় দেখা যায়। ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা গর্ভজাত বেদব্যাস ব্রাহ্মণ ও বিচিত্রবীর্য্য ক্ষত্রিয়; আবার সেই বেদব্যাস ঔরসজাত, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয়। জমদগ্নি পুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও তাঁহার মাতুল বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়।

ব্রাহ্মণ ঔরসজাত ও রাক্ষসভগিনী গর্ভসম্ভূত রাবণ রাক্ষস। কিন্তু ভৃগুপদ-চিহ্নধারী শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়।

মৎস্যগন্ধা, কর্ণ ও ভীষ্মের জন্মগ্রহণ ও তজ্জন্য বর্ণবিভাগের অসামঞ্জস্য ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কর্ণ যদি ব্রাহ্মণ হইতেন তাহা হইলে কুরুক্ষেত্রে পরশুরাম শাপহেতু রথচক্রগ্রাস জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন না।

আধুনিক বর্ণবিভাগের নিয়মানুসারে কশ্যপসন্তান দেবতা ও অসুর উভয়েই ব্রাহ্মণ। রাক্ষস দেবযোনি; সেইহেতু রাক্ষস ও ব্রাহ্মণ। বাল্মীকি "গন্ধমাদনস্থিত" গন্ধর্ব্বকুলকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গিয়াছেন। অমরকোষে লিখিত আছে :—

"বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষ রক্ষো গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ ও রাবণ সেই হেতু ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মহত্যা গুরুপাপ; কিন্তু পাছে লোকের মনে ব্রহ্মহত্যা হেতু রামচন্দ্রের প্রতি অভক্তি জন্মে সেই জন্য মহাকবি বাল্মীকি,

রাবণকে রাক্ষস বলিয়া গিয়াছেন। রাবণকে রাক্ষস না করিলে রামচরিত্রে দোষার্পণ হয়। এই হেতু রাবণ রাক্ষস; নহিলে অন্য কোনও কারণে নহে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নষ্ট হয় শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পরশুরামের যুদ্ধে পৃথিবী যে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল তাহা কি কোনও মহাকবি বর্ণন করিয়াছিলেন? অন্য কোনও পুরাণে বর্ণনা থাকুক বা না থাকুক, বিষ্ণুপুরাণে উহার পূর্ণরূপে বর্ণনা উচিত ছিল। কিন্তু পুরাণ সমূহের বোধ হয় উদ্দেশ্য তাহা নহে, ব্রাহ্মণ কর্তৃক নরহত্যা অতি বীভৎস বলিয়া তাহার নামমাত্র উল্লেখ আছে। কবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে পরশুরামের [illegible] দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি অবতার পরশুরামের স্বর্গপথ রোধ করা যে কতদূর আত্মশ্লাঘাদীপক তাহা বলা যায় না।

"কথায় বলে গরুর নাড় বাছাই।"

যে সব ব্রাহ্মণের সন্তান ও আশ্রয়ে অন্যান্য বর্ণের লোক আকুল সেরূপ ব্রাহ্মণ কত ছিলেন তাহা বলা যায় না। তবে তাঁহাদের সংখ্যা কোনও এককালে দশবারজনের অধিক ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তাঁহাদের অল্পতাহেতু অনেক ঋষির নাম ভিন্নযুগেও শুনিতে পাওয়া যায়। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অল্পতাহেতু রামায়ণ লিখিত ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন জন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সময় যজ্ঞার্থে কাশীতে ব্রাহ্মণ অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল।

আধুনিক বর্ণবিভাগ পূর্বকালে ছিল না; কিন্তু পরে পুরাণাদি রচনার সময় বর্ণবিভাগ আধুনিকভাব কতক পরিমাণে

ধারণ করিয়াছিল; এখন তাহার কাঠিন্য ক্রমে অধিকতর হইয়াছে। এখন এক বর্ণের মধ্যে নানাপ্রকারবর্ণের আবির্ভাব হইয়াছে।

বর্ণবিভাগ ক্রমে এত দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে যে হিন্দুর কোন উদ্যমই কার্য্যকারী হইতেছে না; হিন্দুর স্বার্থ এখন শতকেন্দ্রস্থ হইয়াছে। বর্ণবিভাগহেতু হিন্দু একজাতি হইয়াও সহস্রজাতি হইয়াছে। কথায় বলিতে গেলে হিন্দু এক; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে হিন্দু শত সহস্রজাতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"এ অবস্থা যায় কিসে?"

ব্রাহ্মণ সহজে স্বীকার করিবেন না যে "চণ্ডাল ও তিনি দুই ভাই"। ব্রাহ্মণের মাৎসর্য্য সহজে যাইবার নয়। যতদিন অন্যবর্ণের লোক ব্রাহ্মণ বলিয়া গুরুতর শ্রদ্ধা করিবেন, ততদিন ব্রাহ্মণের গর্ব্ব অক্ষতভাবে বিরাজ করিবে। ব্রাহ্মণ জানেন যে অন্যান্য বর্ণকে নীচজ্ঞান করার জন্যই ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা। স্বেচ্ছায় মর্য্যাদাত্যাগ সামান্য উদারতার কর্ম্ম নহে। অন্যান্য বর্ণের লোক অভ্যাসদোষে আপনাদিগকে নীচ মনে করেন ও ব্রাহ্মণের মর্য্যাদার উৎকর্ষতা সম্পাদন করেন।

যতদিন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অনুমতিমতে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, ততদিন তাঁহাদের শাসনের তুলনায় "ড্রাকোর" শাসনও তুচ্ছজ্ঞান হইত। তাঁহাদের শাসনপ্রণালী শূদ্রপক্ষে নৃশংসতার চূড়ান্ত ছিল। হিন্দু ইংরাজের আর্ম্‌স্ এক্ট, ইলবার্ট বিল প্রভৃতির উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণেরা একই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণপক্ষে গায়ত্রীজপ, প্রাতঃস্নানাদি ও শূদ্রপক্ষে তুষানল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ও সেই

সেই শাস্ত্রানুসারে সহস্র সহস্র শূদ্রের প্রাণনাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূজ্যপাদ শাস্ত্রকর্ত্তা ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকে ও সেই সকল পুস্তককে বেদবাক্যের মত অখণ্ডনীয় ভাবিয়া থাকে। হিন্দুর বিশ্বাস যে রাজ ও সম্রাজপক্ষে পাপের দণ্ড সকলেরই সমান হওয়া উচিত। কিন্তু ধর্ম্মাধ্যক্ষ শাস্ত্রকর্ত্তাগণ শূদ্রের পারত্রপক্ষে তুষানলাদি দয়াল বিধানের ত্রুটী করেন নাই।

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকর্ত্তারা ইহকালে যে অপর সাধারণের নীচত্ব সম্পাদনে ও সেই অবস্থা রক্ষণে সচেষ্ট ছিলেন, তাহা নহে, পরকালেও যাহাতে উহাদের উপর প্রতিপত্তি থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান পথপ্রদর্শক বেদাঙ্গ উপনিষদ্ পাঠ শূদ্রপক্ষে অসম্ভব ছিল। পাঠ ত দূরে থাকুক, ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ভ্রমেও শ্রবণ করিলে শূদ্রের প্রাণদণ্ড হইত। "ওঁ" শব্দ শ্রবণের প্রায়শ্চিত্ত কর্ণে উত্তপ্ত সীসক প্রদান ও ফলে মৃত্যু বিধান করিয়া গিয়াছেন। বাল্মিকী তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছেন যে, শূদ্রের ঈশ্বরোপাসনায় দেশে অকালমৃত্যু ঘটে।

ব্রাহ্মণ নিজে চতুর্দ্দশভুবন-সৃষ্টিকর্ত্তা, অনন্তব্যাপ্ত, দীপ্তমান্, তেজঃস্বরূপ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপী ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন ও শূদ্রপক্ষে খঞ্জহংসারূঢ়া "সুবচনীদেবী" বটবৃক্ষশিকড়স্থ কুম্ভকার নির্ম্মিত "পঞ্চানন্দ" ও বিড়ালবাহিনী ষষ্ঠীদেবী প্রভৃতিতে ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেন। এখনও পুরোহিত মহাশয়েরা এ বিষয়ে কম নহেন। এখনও তাঁহারা পূর্ব্বে প্রাতঃস্নানজপ অর্থাৎ দীপ্তমান্ জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের ধ্যান চিন্তা করিয়া তামার কোশাকুষী লইয়া যজমানের উপর পরকালের প্রতিপত্তি-বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিতে থাকেন।

যে হিন্দুধর্ম আজ জগতে খ্যাত সে ধর্ম কি কেবল "আচার"? সে ধর্ম কি মুষ্টিমেয় শূদ্রাদের ধ্বংসশীল? হিন্দুর উপনিষদ্ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ বিষয়ক পুস্তকই জগতে খ্যাত; কিন্তু বর্ণাশ্রমঘটিত আচার জগতে ঘৃণ্য। সেই হেতু হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা হিন্দুকে নিন্দা করেন।

শাস্ত্রের অর্থ "আইন"। শাস্ত্র দণ্ডবিধানবিষয়ক পুস্তক। রাজত্ব পরিচালনের জন্য যেমন পেনেল কোড্ প্রভৃতির সৃষ্টি, শাস্ত্রগুলিরও উৎপত্তি সেইরূপ। "শাস্ত্র" ধর্মপুস্তক নহে, তাৎকালিক রাজ ও সমাজনীতিবিধায়ক পুস্তক।

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকর্তারা পারতপক্ষে নিজজ্ঞানলব্ধ ধর্মোপদেশ শূদ্রদিগকে কখনও দেন নাই — পাছে তাহারা কালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, সেই ভয়ে কঠোরতম শাস্তির বিধান করিয়া গিয়াছেন। পুরাণের সৃষ্টি অনার্যবর্ণের লোকদিগকে বেদপাঠে বিরত করিয়া চিরঅন্ধকারে রাখিবার চেষ্টা মাত্র।

আধুনিক ব্রাহ্মণেরা তর্ক করেন যে, শূদ্র এত নীচ ছিল যে, বেদপাঠে ও ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাদের অধিকার ছিল না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন কৈ? বরং যাহাতে জ্ঞানলাভ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন কেন? ইংরাজ রাজপুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, ভারতবাসীদিগের রাজকার্য্য সঞ্চালনের অধিকার নাই, ইহাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন; কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজপুরুষেরা যে শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানলাভে পূর্ণ বাধা দিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না। ইহকালের শ্রীবৃদ্ধির কথাত দূরে থাকুক। ওঁ শব্দ উচ্চারণে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদ ও শ্রবণে কর্ণে তপ্তসীসক

প্রদানের ব্যবস্থা কি ব্রাহ্মণের উদারতার নিদর্শন? এই উদারতা হেতু কি বেদব্যাসের জন্মের পর ও মৎস্যগন্ধার কৌমার্য্য? ভৃগুমুণির শ্রীকৃষ্ণবক্ষে পদাঘাতও কি উদারতার চিহ্ন? পৃথিবীতে যিনি বড় হন তাঁর উদারতার বিকাশ কখনও কখনও এইরূপ ভাবে দেখা যায়। পাথাকুলির প্লীহা ফাটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোপে মোক্ষলাভ হইত।

ব্রাহ্মণ নিজকৃত শাস্ত্রফলে (আইনহেতু) এখনও পর্য্যন্ত অন্যান্য বর্ণাপেক্ষা শিক্ষা ও ধর্ম্মভাবে কথক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পাষণ্ড ব্রাহ্মণ সন্তান যে ধার্ম্মিক শূদ্রাপেক্ষা উন্নত ইহা বিশ্বাস হয় না।

একত্র আহার বিহার ব্যতিরেকে জাতীয়ত্ব সম্ভব নয়। শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য হইলে ব্রাহ্মণভক্ত হিন্দুর জাতীয়ত্ব লাভ হইবে না। শূদ্র শতপেষণে পেষিত; এখন আর নির্বীর্য্য ব্রাহ্মণ পেষণ সহ্য করিলে আপনাদের নির্ব্বাণের পথ উন্মুক্ত করিবে।

ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ প্রতিদিন আহ্নিকের সহিত বর্জ্জন করিতে পারেন। শূদ্রান্ন ভোজনের পাপ ব্রাহ্মণের মতে শত প্রাণায়ামদ্বারা মোচন হয়। জাতীয়ত্ব লাভের জন্য ব্রাহ্মণ যদি প্রয়োজনমত শত প্রাণায়াম করিতে সক্ষম না হন, তবে এরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা সমাজের কি উপকার সম্ভব?

ব্যক্তি ও শ্রেণীগত স্বার্থত্যাগই জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বার্থত্যাগে যত উন্নতি সম্ভব, ইতর সাধারণের স্বার্থত্যাগে তত নহে। ব্রাহ্মণ হিন্দুন্নতির মুখ্যপাত্র ছিলেন, তাঁহারা যদি নিজ স্বার্থত্যাগ পূর্ব্বে করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থান যে জগতে অন্যভাব ধারণ করিত এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

পুরাণাদিতে চারিবর্ণের কথা শুনা যায়; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, ক্ষত্রিয় প্রায় নির্লোপ, বৈশ্য নাই বলিলেও চলে, পূর্ব্বের চারি-শ্রেণী এখন মূল দুই ও ক্ষুদ্র কয়েকশ্রেণী হইয়াছে। মূল দুইটীর মধ্যে কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত শত খণ্ড শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন ও তাঁহাদের পাচিত অন্ন আহার না করিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টিত হন। এই ভাব যে কেবল শূদ্রমধ্যে দেখা যায় তাহা নহে, ব্রাহ্মণ মধ্যেও ইহার সম্পূর্ণ আস্থা পরিলক্ষিত হয়। ভাবিয়া দেখিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রে বংশমর্য্যাদার তারতম্য সম্ভব; কিন্তু ব্রাহ্মণমধ্যে ব্রাহ্মণের ও শূদ্রমধ্যে শূদ্রের খণ্ডশ্রেণীগত তারতম্য ও তজ্জন্য বাক্‌বিতণ্ডা আমূল হাস্যোদ্দীপক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বংশমর্য্যাদাহেতু একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা সঙ্কীর্ণচিত্তের বিকাশমাত্র।

হিন্দুর ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপ্ত, হিন্দুর ব্রহ্ম সর্ব্বজীবে সমভাবে বর্ত্তমান; হিন্দুর দেব তৎত্বমসি সোঽহম্ ভাবই হিন্দুর আদর্শ; হিন্দুর বিশ্বাস জগতের পার্থক্য মায়াজাল-উদ্ভূত। সেই মায়া-জাল বা পার্থক্য দূর করাই হিন্দুধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। হে দেব! হে অনাদিনাথ! হে জগদীশ! কি পাপে হিন্দু আজ এ মায়া-জাল-জড়িত! হে ব্রাহ্মণ-সন্তানকুল তোমাদের সহস্র সহস্র পুরুষগত শাস্ত্রানুশীলনের ফলে কি হিন্দু আজ উত্তরোত্তর মায়া-জালজড়িত হইবে?